মহান শিশির ভাদুড়ি জীবন নিয়ে জুয়া খেলেননি

প্রচেত গুপ্ত

দ্যূতক্রীড়ক। ঔপন্যাসিক ব্রাত্য বসুর লেখা সুদীর্ঘ এক কাহিনি। কাহিনি সত্যের ওপর ভিত্তি করে রচিত, কিন্তু সত্যের থেকে গভীর, কঠিন এবং মায়াময়।

বাংলা রঙ্গালয়ের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটি ঘিরে কাহিনির পত্তন। মানুষটি কখনও কাহিনির প্রধান চরিত্র, কখনও প্রধান চরিত্র বাংলার রঙ্গালয়। এ বলে 'আমায় দেখো' তো, সে বলে 'আমায়'। দু'জনে অসি-যুদ্ধ করে। করতে করতে একসময় তাদের আলাদা করা যায় না। মনে হয়, এরা একজনই। ইতিহাস, তথ্য, কল্পনা, ভাবনা, আত্মোন্মোচনের কাহিনি 'দ্যূতক্রীড়ক'। যা একই সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী ও বিস্ময়কর। প্রতিভাধর শিল্পীর জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টিকে (চল্লিশ বছর পর্যন্ত) ভেঙে, গুঁড়ো করে, ছুঁয়ে ছেনে দেখা। ফের মূর্তি বানিয়ে তোলা। এ তো একজনকে নয়, গোটা সত্তাকে দেখা। বাংলার কৃষ্টি, শিল্প, মননের অন্যতম মুখ নাট্যচার্য শিশির কুমার ভাদুড়িকে নিয়ে এর আগেও লেখা হয়েছে। কিন্তু এভাবে হয়নি। শিল্পী যেমন 'ভগবান' নন, তেমন 'মানুষ'ও নন। তিনি শুধুই একজন 'শিল্পী'। কাহিনিকার তাঁর মেধা, অনুসন্ধান, পরিশ্রম, লেখনশৈলী দিয়ে এই ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন।

চারবার চার ভাবে উপন্যাসটি পড়বার সুযোগ হয়েছে। লেখক ছাড়া আর কেউ এতবার কাহিনিটি পড়েছেন কিনা বলতে পারব না। পড়তেও পারেন। আমি পড়েছি চারটি ভিন্ন কারণে। আজকাল পত্রিকার শারদ সংখ্যায় (১৪২৯) কাহিনিটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকার পাতায় আত্মপ্রকাশের আগে কর্মসূত্রে কাহিনিটি দেখতে হয়েছিল। দ্বিতীয়বার পড়ি পত্রিকা প্রকাশের পর। তিন নম্বর পড়া হয় কাহিনি যখন বইয়ের আকারে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে। আর চার, অর্থাৎ এখন পর্যন্ত শেষবারের মত পড়েছি এই লেখাটির জন্য। এই হল চারটি কারণ।

এবার বলি, কোনবার কীভাবে পড়েছি?

প্রথমবার পড়ি পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তুতি হিসেবে। বহুজনের সঙ্গে আমারও একটি ক্ষুদ্র দায়িত্ব ছিল। পড়তে গিয়ে বুঝতে পারি, উপন্যাসটি প্রকাশ পেলে, এটি বাংলা কথাসাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন হবে। এবং একই সঙ্গে বুঝতে পেরেছিলাম, সে বছর শারদ সাহিত্য সম্ভারের সেরা আকর্ষণ হয়ে ওঠবার যাবতীয় গুণাবলী এর মধ্যে রয়েছে। দ্বিতীয়বার পড়া শারদ পত্রিকা প্রকাশের পর। নিছকই কৌতূহলে ফের শুরু করেছিলাম। একটা দুটো পাতা ওলটাতে ওলটাতে পুরোটা শেষ করে ফেলি। এবার যে মুগ্ধতা অনুভব করি, সেটা কর্মচারীর নয়, সাধারণ পাঠকের। কাহিনির নায়ক তরুণ শিশিরকুমার ভাদুড়ি শুধু নন, একটা নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী বাংলার কৃষ্টিজগতের এক সনদ তৈরি করেছেন কাহিনিকার। কোনও কোনও

সময় আমার মনে হয়, মূল চরিত্রটি যতই খ্যাতিতে মূল্যবান হোন না কেন, কাহিনিকার আসলে তাঁকে ঘিরে থাকা সময়কে ধরতে চেয়েছেন। এবার পরিচিতজনদের কাহিনিটি পড়বার জন্য অনুরোধ শুরু করি। কেউ উৎসাহ দেখান, কেউ দেখান না। যেহেতু শারদীয় সংখ্যা দীর্ঘসময় সংরক্ষণ কঠিন, তাই ঠিক করি, এই কাহিনি বই আকারে প্রকাশ পেলে সংগ্রহে রাখব। কেন রাখব? অনেক কারণের একটি হল, এই বই তাকে থাকলে, একজন খাঁটি শিল্পী সঙ্গে থাকবেন। খাঁটি শিল্পের জন্য মঞ্চ বেঁধে দেওয়া একটা খাঁটি সময়ের মধ্যে আমি থাকব। শুধু থিয়েটারে নয়, সর্বার্থেই যে 'খাঁটিত্ব' বাংলার শিল্প সংস্কৃতিতে হারিয়ে যাচ্ছে, ভেজাল আর দেখনাই নিয়ে সবাই যখন ব্যস্ত, সেই সময় বইটি সংগ্রহে থাকা প্রয়োজন। মনে আছে, বইটি কবে পাওয়া যাবে সে বিষয়ে দেখা হলেই লেখক ব্রাত্য বসুকে জিজ্ঞেস করতে শুরু করি। এই প্রশ্ন একজন তুমুল জনপ্রিয়, সব আলোচকদের কাছে প্রংশসিত, সব পক্ষে স্বীকৃত নাট্য ও চলচ্চিত্র পরিচালক, নাটককার, অভিনেতা, নাট্য সংগঠক, আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক কতবার সহ্য করতে পারেন? একদিন বিরক্ত হয়েই বলে বসেন, বই বেরোলে পৌঁছে দেবেন। আমি একটু লজ্জিত হই এবং বেশি নিশ্চিন্ত হই। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে বই প্রকাশের এক দু'দিনের মধ্যেই 'দ্যূতক্রীড়ক' আমার কাছে চলে আসে। ২০২৩ সালের ১৭ মার্চ। আমি এমন আগ্রহ নিয়ে পড়তে শুরু করি যে মনে হয়, এই প্রথম পড়ছি। দুই হার্ডবাউণ্ড মলাটের মধ্যে একই কাহিনি কি আমাকে নতুন কোনও স্বাদ দেয়? পারে কখনও? অবশ্যই দেয়। যে পরত আগের দুই পাঠে আমার কাছে উন্মোচিত হয়নি, এবার সেগুলো পাপড়ি খোলে। পৃথিবীর কোনও মনোগ্রাহী বা ভয়ঙ্কর দৃশ্য যেমন দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থবার দেখায় পৃথক পৃথক ভাবে আসে, পাঠও তাই।

শিশিরকুমার ভাদুড়ির জীবন কি নাটকের মত? নাকি নাটককে ঘিরে গড়ে তোলা এক মহার্ঘ জীবন? যেখানে আলো অন্ধকার, পর্দা ফেলা ও উন্মোচন পূর্বনির্ধারিত নয়। যেখানে কোন দৃশ্যপটের পর কোনটি আসবে তা অনিয়ন্ত্রিত। যেখানে শুরু যদি বা থাকে, 'যবনিকা' নেই। যেখানে প্রম্পটার আড়াল থেকে পার্ট বলে দিলেও কুশীলব তা শোনে না। এই তর্ক অমীমাংসিত। তারপরেও দ্যূতক্রীড়ক পড়ে এমন উপলব্ধি হওয়াটাই স্বাভাবিক।

উপন্যাসটি লিখতে লেখক বিস্তৃত গবেষণার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন। ৫৪টি সহায়ক গ্রন্থের নাম দিয়েছেন। এছাড়া নিশ্চয়ই অজস্র পত্রিকা, প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার তাঁকে পড়তে হয়েছে। লেখকের সুবিধে ছিল, তিনি যাকে নিয়ে লিখছেন সেই মানুষটির এবং তাঁর নিজের নেশাটি এক। থিয়েটার। অবশ্য তার মানে এমনটাও নয় যে ব্রাত্য বসু কোনও ফুটবল খেলোয়াড় বা বংশীবাদকের জীবনকে ভিত্তি করে কাহিনি লিখতে পারবেন না। এমন উনি অজস্র লিখেছেন। একটার পর একটা থিয়েটারই তো লিখেছেন। তবে নিজে থিয়েটারের মানুষ হয়ে থিয়েটারের প্রতিভাকে নিয়ে উপন্যাস লিখতে গেলে বাড়তি সুবিধে তো পেয়েছেন বটেই। চরিত্রের আত্মাকে স্পর্শ করেছেন। আনন্দ বেদনাকে চিনতে পেরেছেন। 'দ্যূতক্রীড়ক' পড়লে বোঝা যায় শুধু ৫৪টি বই আর অজস্র পত্রপত্রিকা থেকে পাওয়া তথ্য নিয়ে এই কাহিনি গড়ে তোলা যায় না। যদি তাই হত, তবে এটিও শিশির ভাদুড়িকে নিয়ে ৫৫তম বই হত মাত্র। মানুষটিকে কল্পনায় দেখতে হয়েছে, কাছে পেতে হয়েছে। বইয়ের পাতা থেকে তুলে সঙ্গ পেতে হয়েছে দীর্ঘ সময়। লেখক তাঁকে কথা বলতে রাজি করিয়েছেন। কতদিন, কত বছর পাশে হেঁটেছেন কেউ বলতে পারেন?

ব্যক্তিত্বের ইতিহাস জীবনচরিতের মূল ভিত্তি। তাকে তথ্যলব্ধ হতেই হবে। তবে লেখক নিছক তথ্যবেত্তা নন। গভীর অনুশীলন যদি না থাকে, যদি সোজা উলটো দু'রকম মত, দু'রকম তথ্য হাতে না থাকে তাহলে সেই কাহিনি অসম্পূর্ণ। লেখক কল্পনায় সেই চরিত্রে রক্তমাংস দেবেন, প্রাণ দেবেন। পাঠক তাকে দেখতে পাবে। তার জীবনের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করতে পারবে। তার সমগ্র সত্তাকে অনুভবের

বলয়ে আনতে পারবে। জীবনীসাহিত্যে কাহিনি থাকে ঠিকই, তবে তা কাহিনিসর্বস্ব নয়। সাহিত্য সত্য বলতে পারে, আবার নাও বলতে পারে। সে ঘটনার সত্যের থেকে জীবনের সত্যের কাছে বেশি দায়বদ্ধ। আজকাল অনেকেই জীবনী সাহিত্যে মন দিয়েছেন। বিভিন্ন পরিধির নানা কৃতী মানুষকে বেছে নিচ্ছেন। বিজ্ঞান থেকে ধর্ম, কবি থেকে বাহুবলী কেউই বাদ যাচ্ছে না। রেফারেন্স ঘেঁটে পাতার পর পাতা লেখা। প্রথম দিকে বিকোচ্ছে কিছু, সমাজমাধ্যমে তৈরি করা হইচইও হচ্ছে খানিকটা, তবে ওই পর্যন্তই। অধিকাংশের আয়ুই ক্ষণকালের। কারণ সেগুলি আর যাই হোক, 'সাহিত্য' নয়, এই রেফারেন্স সেই রেফারেন্স থেকে নেওয়া সারিবদ্ধ ঘটনামাত্র। জীবনের অন্তরালে থাকা জীবনরহস্যটি বিশ্লেষিত না হলে তা 'সাহিত্য' হয় না। হালফিলে এই ধরনের জীবনী যাঁরা লিখছেন, তাঁদের বেশিরভাগেরই এই বিশ্লেষণের যোগ্যতা বা ক্ষমতা নেই। শুনতে মন্দ লাগলেও একথা সত্যি কেউ কেউ শর্টকাটে 'লেখক' হবার জন্য 'জীবনী' হাতড়ে বেড়ায়। সমারসেট মমের সেই কথা সকলেরই জানা। কিছু ঘটনা লিখলেই তা 'জীবনকথা' হয় না। সেই তথ্য থেকে মানুষটাকে চিনতে হবে। তার প্রকৃতি বুঝতে হবে। জেমস্ বসওয়েলের লেখা জীবনীগ্রন্থ 'দ্য লাইফ অব্ স্যামুয়েল জনসন'-কে অনেকেই জীবনীগ্রন্থ হিসেবে উচ্চে স্থান দেন। বসওয়েল কাহিনি আর তথ্যের ভিতর দিয়ে মানুষ জনসনকে যেভাবে এঁকেছেন তা উচ্চপ্রশংসিত। রং, তুলি, ক্যানভাস প্রয়োজন, কিন্তু ছবিটি কেমন হল সেটাই আসল। জীবনচরিত তখনই রসোত্তীর্ণ সাহিত্যকর্ম হয়ে ওঠে যখন তা শুধু চরিত্রটির থাকে না লেখকেরও হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি প্লুতার্ক। আমি নিজে সরাসরি তাঁর কাজ পড়িনি, কিন্তু বিদগ্ধজনের লেখা থেকে জানতে পেরেছি, তিনি ধ্রুপদি সাহিত্যের পরিধিতে জীবনীসাহিত্যে অন্যতম পুরোধা ছিলেন। 'শ্রেষ্ঠ'ই বলা হত। তাঁর অতিখ্যাত 'লাইভস' গ্রন্থে বিখ্যাত ছেচল্লিশজন গ্রিক ও রোমান পুরুষের জীবনী তুলে ধরেছেন। আলোচকরা লেখেন, 'অভ্রান্ত তথ্যনিষ্ঠা ও ব্যক্তিত্বের উদ্ভাসে তিনি সৎ ও মহৎ মানুষের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থের অনুবাদ এলিজাবেথের ইংল্যাণ্ডে সাহিত্য রচনার আকর গ্রন্থ হিসেবে আদৃত হয়েছে। খোদ শেকসপিয়ার নাটক রচনার সময় প্লুতার্কের কাছে ঋণী ছিলেন।

'দ্যূতক্রীড়ক' লেখক ব্রাত্য কি সেই জেমস্ বসওয়েল, প্লুতার্কের পথেরই পথিক? নাট্যাচার্যের জীবন নিয়ে তো বহু গ্রন্থ রয়েছে। তথ্যের অভাব নেই। কিন্তু এই মহা প্রতিভার বৈচিত্রপূর্ণ জীবনের সুর? সেটি কি ব্রাত্য কান পেতে শুনতে পেয়েছেন? শোনাতে পেরেছেন পাঠককে?

পেরেছেন। তবে তা কারও দেখিয়ে দেওয়া 'পথ' নয়, নিজেই শিশিরকুমারের জীবনের মাঝে ঘাস-পথ তৈরি করেছেন। পাঠককে নিয়ে হেঁটেছেন সহজ ভাবে। কখনও মহীরূহের বিশালত্ব, কখনও ঝোপে ফুটে থাকা অকিঞ্চিৎকর কোনও ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ করেছেন। এক মহান অভিনেতার চল্লিশটা বছর নিয়ে কাজ। বৈচিত্রে ভরা। সেই বৈচিত্রের ভিতর লেখক দেখছেন শিল্পীর মনোবাসনা, সাফল্য, ব্যর্থতা, একাকিত্ব, আনন্দ এবং বেদনার জলকণাকে। হাত দিতে গেলে ঝরে যায়, আবার যায়ও না।

এক ভয়ংকর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে কাহিনির সূত্রপাত, শেষে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে প্রয়াত পিতার সঙ্গে নিজের জীবন নিয়ে ডিসকোর্স। শুরুটা যদি অন্ধকার হয়, শেষটা আলোর পথে যাত্রা। এক প্রকৃত শিল্পী শুধু শিল্পের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ। এটাই তার নিয়তি। সৃষ্টিসাগরের ঢেউয়ে চেপে সে এগিয়ে চলে। শিশির ভাদুড়ির জীবনকথাকে কেন্দ্র করে ব্রাত্য যে উপন্যাস লিখেছেন তা শুধু একজনের কথা নয়, সব শিল্পীদের কথা, শিল্পের কথা। এখানেই এই কাহিনির সার্থকতা। লেখকের জীবনবোধের সঙ্গে শিল্পবোধকে মিলিয়ে দিতে পেরেছে। সাহিত্য মুন্সিয়ানায় সেই প্রক্রিয়াটি হয়েছে মসৃণ। কাহিনি থেকে বহু উদাহরণ সামনে এনে এই মতামত প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব, যেহেতু এই লেখা নিছকই এক অকিঞ্চিৎকর পাঠকের ভাললাগার প্রকাশ তাই সুযোগ থাকলেও উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি তুলে লেখাটি ভারাক্রান্ত করতে চাই না।

বইয়ের পিছনের মলাটে পরিচিতিতে বলা হয়েছে, 'বিস্তৃত এই সুদীর্ঘ উপন্যাস নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির বাস্তবিকই এক নাটকীয় জীবনের সুবিন্যস্ত উপস্থাপনা।' আমি একটু ভিন্ন ভাবে বলব, বিস্তৃত এই সুদীর্ঘ উপন্যাস শিশিরকুমার ভাদুড়ির এক সুবিন্যস্ত জীবনের উপন্যাসগুণ সম্পন্ন উপস্থাপনা।

নাটক আর উপন্যাস আলাদা। কেন আর কোথায় সেই তফাৎ? নাটকে সব কিছু ঘটে, ঘটনা আর মানুষের ভাববোধকে কেন্দ্র করে। প্রত্যক্ষ ঘটনা দেখে মানুষকে ভাবতে হয়, ব্যথা পেতে হয়। আগের যুগে নাটক একে সীমাবদ্ধ মনে করেনি, একালে নানা ভঙ্গিতে সীমানা ভাঙা চলছে। এদিকে উপন্যাস জন্মসূত্রে যে সুবিধা নিয়ে এসেছে এবং যেভাবে অন্য সাহিত্যাঙ্গনকে দখল করেছে তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন। নাটককে সব মঞ্চে দেখাতে হয়, উপন্যাসকে দেখাতে হয় মনে। দেখাশোনার পথ ধরে, ইন্দ্রিয়ের দৃশ্য শ্রাব্যের সীমা ডিঙিয়ে নাটক বহুদূর পর্যন্ত আবেদন প্রসারিত করে চলেছে এখন। উপন্যাস পড়া ভাবের উৎসজাত বলে কোনও ইন্দ্রিয়ানুগত্যের দায়ই বহন করে না, সব ইন্দ্রিয়ানুভব এবং তার বাইরের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া উপন্যাসের স্বাভাবিক সঙ্গী হয়ে আছে। ঔপন্যাসিক ঘটনার বিবরণ দিয়ে থাকেন। সেই বিবরণে থাকে কল্পনা, যা ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে না, কিন্তু লেখকের আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করে। উপন্যাস জীবনের সবটাই। যার মধ্যে বাস্তব আছে এবং বাস্তব নেই, নাটক আছে আবার নাটক নেই, সুর আছে আবার বেসুরোও বটে। বিষয় যা-ই হোক উপন্যাস নিজের রাজ্য গড়ে নিতে জানে।

'দ্যূতক্রীড়ক' তার অন্যথা নয়। ব্রাত্য বসু একজন অতি সফল নাটককার হয়েও উপন্যাসে রাজ্য গড়ে নিতে পিছপা হননি। পাকা ঔপন্যাসিকের মতই কৃতী হয়েছেন।

এবার আসি ভাল লাগার সহজ কথায়। 'দ্যূতক্রীড়ক' কেন পড়তেই হয়। একবার নয়, বারবার পড়তে হয়।

১। এক মহান শিল্পীর জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি জানা যাবে। যে জীবন বাঙালির গর্ব। যে জীবন বাংলার গৌরবের থিয়েটারকে আরও গরিমা দিয়েছে, গোটা দেশ, বিশ্বের কাছে পরিচিত করেছে।

২। একজন শিল্পীর বাইরের জীবনের সঙ্গে ভিতরের সৃষ্টির লড়াই কেমন হতে পারে, তাকে ছোঁয়া যায়।

৩। শিল্পীর ভিতর থেকে সুখ দুঃখ অভিমানকে মনোবিদের মতো সামনে এনেছেন লেখক।

৪। বাংলার রঙ্গালয়ের ইতিহাসকে এমন সুললিত ভঙ্গিতে কখনও কি লেখা হয়েছে?

৫। বাংলার গুণীমানীজন গোটা উপন্যাস ছড়িয়ে রয়েছেন মণিমুক্তোর মত।

৬। কখনও মনে হবে, শুধু রবীন্দ্রনাথকে জানবার জন্যই এই কাহিনি বারবার পড়তে হবে। বাংলার থিয়েটার এবং রবীন্দ্রনাথ।

৭। কাহিনিকে যেমন শিল্পী ও শিল্পের আনন্দ, বিষাদ, লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তেমন বিস্ময় এবং আগ্রহরসেও পূর্ণ করা হয়েছে। পড়তে শুরু করলে থামা কঠিন।

৮। কাহিনি যেমন বিশ্লেষণে গভীর, তেমন রোমহর্ষকও বটে। সাহিত্যে 'রোমহর্ষক' বিশেষণ পণ্ডিতেরা খাটো চোখে দেখেন। ভাগ্যিস এই অধমের সেই পাণ্ডিত্য নেই।

৯। গল্প বলার ভঙ্গিটি খুব সহজ। এক অচেনা জগত সম্পর্কে পড়তে গিয়ে কোথাও হোঁচট খেতে হবে না। ইদানিং উপন্যাস লিখতে বসে কেউ কেউ অকারণ জটিল শৈলীর আশ্রয় নেন। নদী জঙ্গলের বিষয়কে পেঁচিয়ে রাখেন। দারিদ্র্য লিখতে গিয়ে এমন ভাষা ব্যবহার করেন যে পাঠ্যপুস্তক বলে মনে হয়। তাঁরা ভুলে যান তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিকবাবুকে দরিদ্র, অন্তজ, প্রান্তিক, সাবঅলটার্নদের কথা বলতে গিয়ে ভাষায় গিঁট পাকাতে হয়নি।

১০। বিস্তৃত অধ্যয়নে 'দ্যূতক্রীড়ক' লেখা হয়েছে। সেই অধ্যয়নকে তিনি আত্মস্থ করেছেন। কাহিনির

সঙ্গে তা মিশে গিয়েছে। ফলে চাপিয়ে দেওয়া ইতিহাসে গল্পরস কোথাও ব্যাহত হয়নি।

১১। লেখক থিয়েটার লেখায় বাংলা তো বটেই, দেশের অগ্রণীদের একজন। থিয়েটারের মুহূর্ত তৈরিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। দৃশ্য উপস্থাপনায় পটু। সবথেকে গুণসম্পন্ন সংলাপে। ব্রাত্য বসুর সংলাপ রচনা সাহিত্যিকদের কাছে হিংসের। এই সহজ গুণপনার প্রতিফলনই 'দ্যূতক্রীড়ক'-এ উপস্থিত।

শেষে বলি, উপন্যাসের শেষ অংশটি মারাত্মক। একজন বড় শিল্পীর চেতনার সঙ্গে অবচেতনের সংঘাত, হাহাকারের সঙ্গে সাফল্যের সংঘাত, অনিশ্চয়তার সঙ্গে লক্ষ্যে অবিচল থাকবার সংঘাত যে ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা মুগ্ধ করে।

শেষের পরেও শেষের কথা হল, আমি 'দ্যূতক্রীড়ক' নামটি পছন্দ করেছি, কিন্তু উপন্যাসটি শেষ হবার পর মেনে নিতে পারিনি। মহান শিশিরকুমার ভাদুড়ি জীবন নিয়ে জুয়ো খেলেননি। তিনি নিয়তিতাড়িতও নন। যাঁর এত প্রতিভা, লক্ষ্যে এতটাই নিবিষ্ট, তাঁকে জুয়ো খেলতে হবে কেন? তিনি শিল্পকে, জীবনকে, নিয়তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

'দ্যূতক্রীড়ক'-এর লেখক ব্রাত্য বসুকে বাংলা সাহিত্যে এই উজ্বল সংযোজনের জন্য অভিনন্দন।

দ্যূতক্রীড়ক
ব্রাত্য বসু
আনন্দ পাবলিশার্স
মূল্য ৬০০ টাকা

প্রচেত গুপ্ত : প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক।